নবীর কুরআনী পরিচয়

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

নবীর কুরআনী পরিচয়

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৯৮

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন-১৯৮৫ইং
৬ষ্ঠ প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২৫
জ্যৈষ্ঠ	১৪১১
মে	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৮.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

NABIR QURAANI PARICHOY by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 8.00 Only.

দুটি কথা

মূলত, এ নিবন্ধটি ১৯২৭ সালে দিল্লীর 'আল জমীয়ত' পত্রিকার হাবীব সংখ্যার জন্যে লিখা হয়। পরে ১৯৪৪ সালে প্রবন্ধটি 'তরজমানুল কুরআনে' দ্বিতীয়বার ছাপা হয়। অতপর একে গ্রন্থকারে বিখ্যাত 'তাফহীমাত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত করা হয়। সর্বশেষে গ্রন্থকার প্রবন্ধটিকে তাঁর 'সীরাতে সরওরারে আলম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে স্থান দেন। এই প্রবন্ধটির উর্দু নাম হচ্ছেঃ 'কুরআন আপনে লা–নেওয়ালে কো কেস্‌ রং মে পেশ করতা হায়।'

কুরআন তার বাহককে কি মর্যাদা দান করেছে, কি পরিচয়ে তাঁকে পেশ করেছে, কি দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেছে আর এ মহাগ্রন্থের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবেই বা তিনি কেমন ছিলেন, একথাগুলোর চমৎকার বর্ণনা রয়েছে এ প্রবন্ধে। আর একথাগুলো জানা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য এবং প্রতিটি মানুষের শাশ্বত অধিকার। বিষয়টির এ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই আমরা এটিকে আলাদা পুস্তিকাকারে অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি।

জুন ১৯৮৫ ইং   আবদুস শহীদ নাসিম

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নবীর কোরআনী পরিচয়

দুনিয়ায় মানব জাতির হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে সব সময় এমন সব মনীষীদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে,যারা নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা দুনিয়াকে সত্য ও সত্যবাদিতার সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ তাঁদের এ মহান উপকারের বিনিময় যুলুম ও অত্যাচারের আকারে দিয়েছে। তারা তাঁদের পয়গাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাঁদের সত্যবাদিতা অস্বীকার করেছে, তাঁদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁদের উপর নির্যাতন চালিয়ে ও তাঁদের কষ্ট দিয়ে তাঁদের সত্য পথ থেকে ফিরাবার চেষ্টা করেছে। এমনি করে তাঁদের প্রতি যুলুম শুধু তাদের বিরোধীরাই করেনি, বরঞ্চ তাঁদের প্রতি যুলুম তাঁদের ভক্ত অনুরক্তরাও করেছে। যেমন তাঁদের মৃত্যুর পর এরা তাঁদের শিক্ষাকে বিকৃত করেছে, তাঁদের পথনির্দেশকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাঁদের আনীত কিতাবে রদবদল করেছে এবং স্বয়ং তাদের ব্যক্তিসত্ত্বাকে উদ্ভট খেলতামাশায় পরিণত করে খোদায়ীর রঙে রঞ্জিত করেছে। প্রথমোক্ত যুলুম তো সে মনীষীদের জীবদ্দশায় অথবা তারপর বড়জোর কয়েক বছর চলেছে। কিন্তু শেষোক্ত যুলুম তাঁদের পরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকে এবং অনেক মনীষীর সঙ্গে এখনো চলছে।

এ যাবত দুনিয়ায় সত্যের যতো আহবানকারীই প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন–ঐসব মিথ্যা খোদার খোদায়ী নিশ্চিহ্ন করার জন্যে, যাদেরকে মানুষ এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে খোদা বানিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু সর্বদা এটাই হতে থাকে যে, তাঁদের পরে তাঁদের অনুসারীরা জাহেলী আক্বীদাহ্–বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বয়ং এই মনীষীদেরকেই খোদা অথবা খোদার খোদায়ীতে শরীক বানিয়ে নিয়েছে। আর তাঁদেরকে সে সব প্রতিমার মধ্যে শামিল করে নিয়েছে, যেগুলোকে চূর্ণ করার জন্যে তাঁরা গোটা জীবন পরিশ্রম করে গিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, মানবাত্মায় স্বর্গীয় গুনাবলীর সম্ভাবনা ও অস্তীত্ব সম্পর্কে সে খুব কমই একীন রাখে। সে নিজেকে নিছক দুর্বলতা– হীনতার সমষ্টি মনে করে। তার মনে সাধারণত এ মহাসত্যের জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকেনা যে,তার এ মাটির দেহে

আল্লাহ তায়ালা এমন সব শক্তি সামর্থ দান করেছেন যা তাকে মানুষ হওয়া ও মানবিক গুনাবলীতে ভূষিত থাকা সত্ত্বেও উর্দ্ধজগতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চতর মর্যাদায় পৌছাতে পারে। তাইতো দুনিয়ার কোনো মানুষ যখনই নিজেকে খোদার পয়গম্বর হিসেবে পেশ করেছেন, তখন তাঁর স্বজাতির লোকেরাই এই বলে তাঁকে খোদার পয়গম্বর মানতে অস্বীকার করেছে যে, এ তো আমাদেরই মতো রক্ত মাংসের মানুষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর মধ্যে অসাধারণ সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের জ্যোতি লক্ষ্য করে তারা বিশ্বাসের মস্তক অবনমিত করলো, তখনই আবার তারাও বলে বসলোঃ যে সত্তা এমন অসাধারণ সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের অধিকারী, তিনি কখনো মানুষ হতে পারেন না। অতপর একদল লোক তাঁকে খোদা বানিয়ে বসলো, আবার কেউ সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের মতবাদ আবিস্কার করে বিশ্বাস করে বসলো যে, খোদা তাঁর রুপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কেউ আবার তাঁর মধ্যে খোদায়ী গুনাবলী এবং খোদায়ী কুদরাত ও ক্ষমতার ধারণা করে বসলো। আবার কেউ ঘোষণাই করে দিলো যে, 'তিনি খোদার পুত্র।'

سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ

আপন আপন ধর্ম প্রবর্তক সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধারণা বিশ্বাস

দুনিয়ার যে কোনো ধর্মপ্রবর্তকের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর অনুসারীরাই তাঁর প্রতি অধিক যুলুম করেছে। অলীক কল্পনা ও কুসংস্কারের পর্দা দিয়ে তাকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে, আজ তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়াই মুশকিল। এমনকি তাঁর বিকৃত করা গ্রন্থাবলী থেকে আজ এ ধারণা করাই কঠিন যে, তাঁর মুল শিক্ষা কি ছিলো আর স্বয়ং তিনিইবা কি ছিলেন? তাঁর জন্ম, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা, এবং তাঁর মৃত্যু চরম আজগুবী ও অলৌকিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ। মোট কথা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনটা একটা অলীক কাহিনী বলেই মনে হয়। তাঁকে এমনভাবে পেশ করা হয় যেনো স্বয়ং তিনিই খোদা ছিলেন কিংবা খোদার পুত্র। অথবা খোদার মূর্তরূপ বা অবতার অথবা অন্ততপক্ষে খোদায়ীর কিছুটা অংশীদার।

বৌদ্ধ

উদাহরণস্বরূপ গৌতম বৌদ্ধের কথা বলা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের গভীর অধ্যয়নের ফলে এতোটুকু অনুমান করা যায় যে, এ মহান ব্যক্তি ব্রাহ্মন্যবাদের বহু ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করেছেন। বিশেষ করে তিনি সে সব অসংখ্য সত্তার খোদায়ী খন্ডন করেন যাদেরকে সে যুগের লোকেরা নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিলো। অথচ তাঁর মৃত্যুর পর এক শতাব্দী অতিবাহিত হতে না হতেই তাঁর অনুসারীরা তাঁর সকল শিক্ষা পরিবর্তন করে ফেলে। মুল সূত্রের পরিবর্তে নতুন সূত্র তৈরী করে নেয় এবং তাঁর মুলনীতি ও বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় নিজেদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী রদবদল করে নেয়। এক দিকে তারা বৌদ্ধের নামে নিজেদের ধর্মে এমন সব আক্বীদাহ্-বিশ্বাস নির্ধারিত করে নিয়েছে যাতে খোদার কোনো অস্তিত্বই ছিলনা। অন্যদিকে তারা বৌদ্ধকে সর্ববোধি, বিশ্বনিয়ন্তা এবং এমন এক সত্তা হিসেবে অভিহিত করে যিনি যুগে যুগে বৌদ্ধদের রূপ ধারণ করে দুনিয়ার সংস্কারের জন্যে আগমন করে থাকেন। তাঁর জন্ম, জীবনী এবং অতীত ও ভবিষ্যত জন্ম সম্পর্কে এমন সব অলীক কাহিনী রচনা করে নিয়েছে যা পড়ে অধ্যাপক উইলসনের মতো পন্ডিত ব্যক্তি বিস্মিত হয়ে বলেনঃ প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসে বৌদ্ধের কোনো অস্তিত্বই নেই। তিন চার শতাব্দীর মধ্যে এসব কাহিনী বৌদ্ধকে সম্পূর্ণ খোদায়ীর রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছে। কনিস্কের যুগে বৌদ্ধ ধর্মের সভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক বিরাট সম্মেলন কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, বৌদ্ধ প্রকৃতপক্ষে খোদার দৈহিক প্রকাশ। অথবা অন্য কথায় খোদা বৌদ্ধের দেহে রুপান্তরিত হন।

রাম

রামচন্দ্রের সাথেও একই আচরণ করা হয়। রামায়ণ অধ্যয়ন করলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, রামচন্দ্র একজন মানুষ বই কিছুই ছিলেন না। সততা, ইনসাফ, বীরত্ব, উদারতা, বিনয়, ধৈর্যশীলতা এবং ত্যাগ প্রভৃতি গুনাবলী তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিলো বটে, কিন্তু খোদায়ীর চিহ্নমাত্র তাঁর মধ্যে ছিলনা। কিন্তু তাঁর মধ্যে উচ্চতর মনুষ্যত্ব এবং সে সাথে এতোগুলো ভালো গুণের একত্র সমাবেশ ভারতবাসীর নিকট এক প্রহেলিকা বলে প্রমাণিত হয় এবং তাদের জ্ঞানবুদ্ধি এর সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং; রামচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পর এ ধারণা

বিশ্বাস মেনে নেয়া হয় যে, তাঁর মধ্যে বিষ্ণু [১] রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আর রামচন্দ্র সেসব সত্তার মধ্যে একজন যাদের রূপ পরিগ্রহ করে দুনিয়ার সংসারের জন্যে বিষ্ণু যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেন।

কৃষ্ণ

এ ব্যাপারে উল্লেখিত দুজনের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বাধিক যুলুম করা হয়েছে। শ্রীভগবতগীতা বিকৃতি ও রদবদলের কয়েক পর্যায় অতিক্রম করার পরও আমাদের কাছে যে অবস্থায় পৌছেছে তা গভীরভাবে অধ্যায়ন করলে অন্তত এতোটুকু জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ একেশ্বরবাদী ছিলেন। "আল্লাহ তায়ালা সার্বভৌম সর্বশক্তিমান" হওয়ার উপদেশ তিনি মানুষকে দিতেন। কিন্তু মহাভারত বিষ্ণু পুরান, ভগবত পুরান ইত্যাদি গ্রন্থাবলী এবং খোদ গীতা তাঁকে এমনভাবে পেশ করে যে, একদিকে দেখা যায় তিনি বিষ্ণুর দৈহিক প্রকাশ, সবকিছুর স্রষ্টা এবং জগতের পরিচালক। অপর দিকে তাঁর প্রতি এমন সব দুর্বলতা আরোপ করা হয়েছে যে, তাঁকে খোদাতো দুরের কথা একজন পূত-চরিত্রবান মানুষ হিসেবে মেনে নেওয়াও কঠিন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নিম্মোক্ত বানী সমুহ পাওয়া যায়ঃ

"আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা; যা কিছু জ্ঞেয় এবং পবিত্র বস্তু তা আমি। আমি ব্রহ্মবাচক, ওঙ্কার, আমিই ঋক, সাম ও যজুর্বেদ। আমিই প্রানীর পরাগতি ও পরিচালক, আমি প্রভু সকল প্রানীর নিবাস, তাদের শুভাশুভের দ্রষ্টা। আমিই রক্ষক এবং হিতকারী, আমি স্রষ্টা এবং সংহর্তা। আমিই আধার এবং প্রলয়স্থান আর আমিই জগতের অবিনাশী কারণ। (সুর্যরুপে) আমিই তাপ বিকিরণ করি এবং জল আকর্ষণ ও বর্ষণ করি। আমি (দেবগনের) অমৃত ও (মর্তগনের) মৃত্যু। আমি অবিনাসী আত্মা, আমিই নশ্বর জগত।" (গীতা-(৯ঃ১৭-১৯দ্রঃ)

"ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেউ আমার উৎপত্তির তত্ত্ব জানেনা। কেননা আমি সর্ব প্রকারের দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি কারণ। যিনি আমাকে আদিহীন জন্মহীন এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন,

---

১. হিন্দুদের বর্তমান আক্বীদাহ্-বিশ্বাস অনুযায়ী বিষ্ণু জগতের প্রতিপালক খোদা বা দেবতা। সম্ভবত, মূলে ছিলো আল্লাহ তায়ালার রবুবিয়াত গুণের ধারণা-যাকে পরবর্তী কালে একটা স্থায়ী ব্যাক্তিত্ব বলে অভিহিত করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে মূর্তিপুজার সূচনা এভাবেই হয় যে, তারা আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি গুনকে মূলসত্তা থেকে আলাদা করে একেকটিকে এক এক খোদা বলে অভিহিত করে।-গ্রন্থকার

মনুষ্য মধ্যে তিনিই মোহশুন্য হয়ে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হন।" (গীতা–১০ঃ২–৩)

"হে জিতনিন্দ্র অর্জুন! আমিই সব প্রানির হৃদয়ে অবস্থিত চৈতন্যময় আত্মা এবং প্রাণীগণের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার স্বরূপ, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণুনামক আদিত্য। জ্যোতিকগনের মধ্যে আমি উজ্জ্বল সূর্য। উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি এবং আমি নক্ষত্র গণের মধ্যে চন্দ্র।" (গীতা ১০–২০–২১)

"আমি নাগগণের মধ্যে নাগরাজ অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে রাজা বরুণ আমি এই সমগ্র বিশ্বমাত্র একাংশে ধারণ করে আছি।" (গীতাঃ১০–২৯–৪৪)

"যিনি আমারই কর্মজ্ঞানে সকল কর্মকরেন, আমিই যার একমাত্র গতি যিনি আমার ভক্ত, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিহীন এবং সমস্ত প্রাণীতে দ্বেষশূন্য– তিনি আমাকে লাভ করেন। (গীতা ১১–৫৫)

আমি জন্মরহিত অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর, তবু নিজের শুদ্ধসত্ব প্রকৃতিতে আশ্রয় করে নিজের মায়া শক্তি বলে আমি যেন জন্মগ্রহন করি, যখনই ধর্মের পতন ও অধর্মের উথান হয় তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের রক্ষার জন্যে দুষ্টগণের বিনাশের জন্যে এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হই। " (গীতা ৪ঃ৬–৮)

এসব শ্লোকে গীতার শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট খোদা হবার দাবী করেছে।[১] অন্যদিকে পুরান–এ শ্রীকৃষ্ণকেই এমনভাবে চিত্রিত করছে যে গোসলের সময় তিনি গোপীদের পরিধেয় বস্ত্র লুকিয়ে রাখেন। তাদেরকে উপভোগ করার জন্যে যতোজন গোপী ততোগুলো দেহ ধারণ করেন। আর রাজা পুরক্ষিত যখন সুকমুনিকে জিজ্ঞেস করেন যে, "খোদা তো অবতার স্বরূপ সত্য ধর্ম প্রচারের জন্যে আত্ম প্রকাশ করেন কিন্তু এ আবার কেমন খোদা, যে ধর্মের সকল রীতি নীতি লংঘন করে পরস্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে?"

১· গীতা যদি নিজেকে খোদার কিতাব এবং শ্রীকৃষ্ণকে তার বাহক বলে দাবী করতো, তবে উল্লেখিত বাণী সমূহ খোদার বাণী মনে করা হতো এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খোদায়ীর দাবী আরোপ করা হতোনা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, এ গ্রন্থ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বাণী হিসেবে পেশ করছে। গোটা গীতার কোথাও এ কথার ইংগিত পর্যন্ত নেই যে, তা খোদার বাণী বা অহী বা ইলহামের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।–গ্রন্থকার

অভিযোগ খন্ডনের জন্যে মুনি এ কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, স্বয়ং দেবতা ও কোনো কোনো সময় সৎ পথ থেকে বিচ্যুত হন। কিন্তু তাদের পাপ তাদের নিজেদের উপর কোনো ছাপ রাখতে পারেনা। যেমন আগুন সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও তাকে অভিযুক্ত করা যায় না।"

কোনো প্রখ্যাত ধর্ম গুরুর জীবন এতো নোংরা হতে পারে, বিবেক সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি তা মেনে নিতে পারেনা এবং এ ধারণা করতে পারেনা যে, কোনো সত্যিকার ধর্মগুরু প্রকৃতপক্ষে নিজেকে মানুষ ও সৃষ্টিলোকের প্রভু হিসেবে পেশ করবে। কিন্তু কোরআন ও বাইবেল উভয় গ্রন্থ তুলনামূলক ভাবে অধ্যয়ন করলে এ সত্য আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের মানসিক ও নৈতিক অধপতনের যুগে কিভাবে জগতের পবিত্রতম মনীষীদের জীবন চরিতকে একদিকে জঘন্যতম রূপে চিত্রিত করেছে যাতে করে নিজেদের যাবতীয় নোংরামী ও দুর্বলতার বৈধতা প্রমাণ করা যায়। অপরদিকে তাঁদের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রচনা করেছে উদ্ভট কাহিনী। এজন্যে আমরা মনে করি শ্রীকৃষ্ণের সাথেও এসব কিছুই করা হয়েছে এবং হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী তাকে যেভাবে পেশ করেছে তা থেকে তাঁর মূল শিক্ষা ও আসল ব্যক্তিত্ব ভিন্নরূপ হয়ে থাকবে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

যে সকল মনীষীর নবুওয়াত জ্ঞাত ও সর্বজন স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক যুলুম হয়েছে সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি। হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ার সকল মানুষেরই মতো একজন মানুষ ছিলেন। মনুষত্বের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ঠিক তেমনি ছিলো যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থেকে থাকে। পার্থক্য শুধু এতোটুকু ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে হিকমাত, নবুওয়াত ও মুজিযা শক্তি দিয়ে একটা অধপতিত জাতির সংশোধনের জন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রথমত তাঁর জাতিই তাঁকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করে এবং তিন বছর তো তারা তাঁর ভাগ্যবান অস্তিত্বই বরদাশত করেনি। এমনকি তাঁর পূর্ণ যৌবনে তারা তাঁকে হত্যা করার ফয়সালা করে। কিন্তু এর পরে যখন তারা তাঁর মহত্ব স্বীকার করে নিলো, তখন তারা এতোদূর সীমা লংঘন করে বসলো যে, তারা তাঁকে খোদার পুত্র তথা খোদা আখ্যায়িত করলো। তারপরও তারা এ আকীদাহ্ বিশ্বাস তাঁর প্রতি আরোপ করলো যে, শুলে চড়ে মানুষের গুনাহের কাফ্ফারা আদায় করার জন্যে মসীহর আকৃতিতে স্বয়ং খোদা আবির্ভূত হয়েছেন। কারণ মানুষ স্বভাবতই

পাপী ছিলো এবং সে নিজের আমল দ্বারা মুক্তি লাভ করতে পারতো না। মায়াযাল্লাহ! একজন সত্যবাদী নবী তাঁর প্রতিপালকের উপর এতো বড় মিথ্যা অপবাদ কেমন করে আরোপ করতে পারতেন? কিন্তু তাঁর ভক্ত অনুরক্তগণ ভক্তি শ্রদ্ধার আবেগে তাঁর প্রতি এসব মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাঁর শিক্ষাকে তাদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী তারা এমনভাবে বিকৃত করে যে আজকাল একমাত্র কোরআন মজীদ ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো গ্রন্থেই হযরত ঈসা (আঃ) এর জীবনী এবং তাঁর শিক্ষার কোনো নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টে চার ইনজিল নামে যেসব গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলো হযরত ঈসার মধ্যে খোদার আত্মপ্রকাশ তাঁর খোদার পুত্র ও খোদার মুলসত্তা হবার ভ্রান্ত চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ। কোথাও হযরত মরিয়মের প্রতি এ বলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছেঃ 'তোমার সন্তানকে খোদার পুত্র বলা হবে।' (লুক-১ঃ ৩৫) কোথাও খোদার রুহ কবুতরের আকৃতিতে ইউসুর নিকট এসে বলেঃ এ 'আমার প্রিয় পুত্র।' (মতি-১৬ঃ১৭)। কোথাও স্বয়ং মসীহ্‌কে বলতে দেখা যায়ঃ 'আমি খোদার পুত্র। তোমরা আমাকে সর্ব শক্তিমানের ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে।' (মারক্‌স-১৪ঃ৬২) 'কোথাও মসীহ্‌কে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র সিংহাসনে বসানো হয়েছে এবং তিনি সেখানে শাস্তি ও পুরস্কারের ফরমান জারি করছেন।' (মতি-২৫ঃ৩১-৪৬)। কখনো হযরত ঈসার মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছেঃ 'পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমি পিতার মধ্যে আছি।' (ইউহান্না-১ঃ৩৮)। কোথাও আবার সে সত্যবাদী মানুষটির মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছেঃ 'আমি খোদার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছি।' (ইউহান্না-৮ঃ৪২)। কোথাও তাঁকে এবং খোদাকে সম্পূর্ণ এক সত্তায় পরিণত করা হয়েছে এবং তাঁর প্রতি এ উক্তি আরোপ করা হয়েছে যেঃ 'যে ব্যক্তি আমাকে দেখলো, সে পিতাকে দেখলো।' এবং "পিতা আমার মধ্যে অবস্থান করে তাঁর কর্মসম্পাদন করেন।" (ইউহান্না ১৪ঃ৯-১০)। কোথাও খোদা তাঁর খোদায়ীর সমস্ত দায়িত্ব মসীহ্‌র উপর সোপর্দ করে দিচ্ছেন (ইউহান্না৫ঃ২০-২২)

এসব বিভিন্ন জাতি নিজেদের নবী ও পথ প্রদর্শকদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার জাল বিস্তার করেছে, তার আসল কারণ হচ্ছে সেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন যা সূচনাতেই আমরা উল্লেখ করেছি। তারপর যে জিনিসটি এর সহায়ক হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এসব মনীষীদের পরে অধিকাংশ সময়ে তাঁদের হেদায়াত ও শিক্ষা-দীক্ষা লিপি-বদ্ধ করা হয়নি। আবার কোনো সময়ে এদিকে মনোযোগ দেয়া হলেও তা সংরক্ষণের কোনো

ব্যবস্থা হয়নি। অতএব তাঁদের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তা এমন ভেজাল, বিকৃত ও রদবদল হয়ে যায় যে খাঁটি ও মেকির মধ্যে পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

এভাবে তাঁদের হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে বর্তমান না থাকায় তার ফল এ দাঁড়ায় যে, যতোই দিন যেতে থাকে ততোই সত্য কুসংস্কারের বেড়াজালে আছন্ন হতে থাকে। এমনি করে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সকল সত্যই বিলুপ্ত হয়ে গেলো। বাকী থাকলো শুধু কল্প কাহিনী।

সায়্যিদুনা মুহাম্মদ (সঃ)

দুনিয়ার সকল নবী ও পথ প্রদর্শকের মধ্যে শুধু মাত্র মুহাম্মদ (সঃ) –ই এ বিশেষত্ব লাভ করেন যে, বিগত তেরশ বছর যাবত তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ সঠিক ও অবিকৃত অবস্থায় সুরক্ষিত রয়েছে। আর আল্লাহর মেহেরবাণীতে তা সংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা হয়ে গেছে যে, কোনো অবস্থাতেই তা বিকৃত হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ কুসংস্কারের দাস ও বিস্ময়কর বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হবার কারণে এটা তার জন্যে অসম্ভব ছিল না যে, সে পূর্ণতার সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত এ মহা মানবকেও কাহিনীর মাধ্যমে কোনো না কোনো প্রকার খোদায়ীর গুণে গুণান্বিত করতো এবং আনুগত্যের পরিবর্তে তাঁকে বিস্ময় প্রকাশ ইবাদত ও পূজার বিষয়বস্তুতে পরিণত করতো কিন্তু নবী পরম্পরায় শেষ পর্যায়ে এমন একজন পথ প্রদর্শক প্রেরণ আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রেত ছিলো যিনি মানব জাতির যাবতীয় আমল ও কর্মকান্ডের শাশ্বত আদর্শ ও বিশ্বজনীন হেদায়াতের উৎস হবেন। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (সঃ) ইবনে আবদুল্লাহকে সে যুলুম থেকে রক্ষা করেন যা জাহেল ভক্ত–অনুরক্তগণ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম ও জাতীয় পথ–প্রদর্শকের প্রতি করতে থাকে। প্রথম কথা এই যে, পূর্ববতী উম্মতগণের বিপরীত নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সাহাবীগণ, তাবেয়ীন ও মুহদ্দিসগণ তাঁদের নবীপাকের সীরাত সংরক্ষনের স্বয়ং অসাধারণ ব্যবস্থাপনা করেছেন যার কারণে চৌদ্দশ বছর অতীত হবার পরও তাঁর ব্যক্তিত্বকে আজ আমরা এতোটা নিকট থেকে দেখতে পাই,যতোটা নিকট থেকে দেখতে পেতেন তাঁর যুগের লোকজন। দ্বীন ইসলামের ইমামগণ বছরের পর বছর ধরে আপ্রান প্রচেষ্টার পর যে সব গ্রন্থাদি রচনা করেছেন তার গোটা ভান্ডার যদি আজ বিলুপ্ত হয়ে যায় হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের একটি পাতাও যদি দুনিয়ায় না থাকে, যার দ্বারা নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন বৃত্তান্ত জানা যেতে পারে, আর থাকে যদি-শুধু আল্লার কিতাব কোরআন পাক, তাহলেও এ কিতাব থেকেই ঐ সকল

মৌলিক প্রশ্নের জবাব আমরা পেতে পারি, যা এ কিতাবের বাহক সম্পর্কে একজন ছাত্রের মনে জাগ্রত হয়।

আসুন এবার আমরা দেখি–কোরআন তার বাহককে কিভাবে পেশ করে।

রসূল একজন মানুষ

কোরআন মজীদ রেসালাত সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে রসূলের মানুষ হবার বিষয়টি। কোরআন নাযিল হবার পূর্বে বহু শতাব্দীর ধারণা বিশ্বাস এটাকে একটা মীমাংসিত ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছিল যে, মানুষ কখনো আল্লাহ্‌র রসূল বা প্রতিনিধি হতে পারে না। জগতের সংস্কার সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিলে খোদা নিজেই মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন অথবা কোনো ফেরেশতা কিংবা দেবতা প্রেরণ করেন। আর জগতের সংস্কার সংশোধনের জন্যে এযাবত যতোবুযুর্গই এসেছেন–তাঁরা সকলেই অতি মানব ছিলেন। এ ধারণা –বিশ্বাস মানুষের মনের গভীরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, যখনই খোদার কোনো নেক বান্দাহ মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেবার জন্যে আগমন করতেন তখন লোকেরা বিস্ময়ের সাথে প্রথম প্রশ্নই করতো–'এ আবার কেমন রসূল যে আমাদের মতোই পানাহার করে, ঘুমায় এবং চলাফেরা করে? এ কেমন পয়গম্বর যে, আমাদেরই মতো নানান অসুবিধা ভোগ করে? রোগগ্রস্ত হয়? সুখ–দুঃখ ও আনন্দ অনুভব করে? আমাদের হেদায়াতই যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো, তা হলে এ কাজে তিনি আমাদেরই মতো একজন দুর্বল মানুষকে কেন পাঠালেন? খোদা কি স্বয়ং আসতে পারতেন না? প্রত্যেক নবীর আগমনের পরই লোকেরা এসব প্রশ্ন করতো এবং এসবকে বাহানা বানিয়ে তারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে অস্বীকার করতো। হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির নিকট আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এলে তাঁকে বলা হলোঃ

مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ
لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ - (مؤمنون: ٢٤)

"এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। সে আসলে তোমাদের উপর মর্যাদাবান হতে চায়। অথচ আল্লাহ্‌ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা পাঠাতেন। (মানুষ কখনো খোদার পয়গম্বর হয়ে

আসবে) এমন আজগুবী কথাতো আমাদের পূর্ব পুরুষদের বলতে শুনিনি।" (আল–মুমেনূন:২৪)

হযরত হুদ (আঃ) যখন তাঁর জাতির নিকট আল্লাহর পয়গামসহ প্রেরিত হন, তখন সর্ব প্রথম এ আপত্তিই উথাপন করা হয়ঃ

مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ
مِمَّا تَشْرَبُوْنَ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ط

এ ব্যক্তিতো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। তোমরা যা খাও সেও তাই খায়। তোমরা যা পান করো সেও তা–ই পান করে। তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো, তাহলে নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (আল–মুমেনূনঃ ৩৩–৩৪)

হযরত মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) যখন ফেরাউনের নিকট সত্যের পয়গাম নিয়ে পৌছুলেন, তখন ঐ একই কারণে তাঁদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা হলোঃ

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا (مومنون:٤٧)

আমরা কি আমাদেরই মতো দুজন মানুষের প্রতি ঈমান আনবো? (আল–মুমেনূনঃ৪৭)

ঠিক এ প্রশ্নই তখনো উথাপিত হয়েছিল, যখন মক্কায় একজন উম্মী মানুষ চল্লিশটি বছর নীরব জীবন–যাপন করার পর হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলেনঃ আমাকে খোদার পক্ষ থেকে মনোনীত করা হয়েছে। মানুষ বুঝতে পারছিলনা যে,তাদেরই মতো হাত–পা, নাক, চোখ, দেহ এবং প্রাণ আছে এমন একজন মানুষ কেমন করে নবী হতে পারে? তারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করতোঃ

مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ
اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ
تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۔ (الفرقان:٧-٨)

"এ আবার কেমন রসূল যে খাওয়া দাওয়া করে এবং হাট বাজারে যাতায়াত করে? তার নিকট কোনো ফেরেশতা প্রেরিত হলনা কেন যে তার সাথে থেকে লোকদের ভয় দেখাতো। অথবা নিজের পক্ষে, কোনো ধনভান্ডার

ধনভান্ডার অবতীর্ণ করা হতো কিংবা তাঁর নিকট এমন কোনো বাগান থাকতো যার ফল সে খেতো",–(ফোরকানঃ৭–৮)

রেসালাত মেনে নেবার ব্যাপারে লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসই যেহেতু সবচাইতে বেশী প্রতিবন্ধক ছিলো, তাই কোরআন জোরালো ভাষায় তা খন্ডন করে এবং যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, মানুষের হেদায়াতের জন্যে মানুষই যথোপযুক্ত। কারণ রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য তো শুধু মানুষকে শিক্ষা দেয়াই নয়, বরঞ্চ এর সাথে সাথে তিনি নিজেও আমল করে দেখাবেন এবং কিভাবে আনুগত্য অনুসরণ করতে হয় তার নমুনাও পেশ করবেন। এ উদ্দেশ্যে যদি কোনো ফেরেশতা কিংবা কোনো অতিমানবকে পাঠানো হতো যার মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্য থাকতোনা– তাহলে তো মানুষ বলে উঠতো, আমরা কেমন করে তার মতো আমল করতে পারি, যার মধ্যে আমাদের মতো কামনা বাসনা নেই এবং যার প্রকৃতির মধ্যে সেসব শক্তি নেই যা মানুষকে পাপের প্রতি আকৃষ্ট করে?

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ
مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا (بنی اسرائیل: ۹۵)

যমীনে যদি ফেরেশতা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতো, তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের হেদায়াতের জন্যে আকাশ থেকে কোনো ফেরেশতাকেই রসূল করে পাঠাতাম –(বনী ইসরাঈলঃ৯৫)

অতপর সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয় যে, এর আগে বিভিন্ন জাতির নিকট যতো আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পথ প্রদর্শক পাঠানো হয়েছে–তাঁরা সকলেই নবী মুহাম্মদ (সঃ) এরই মতো মানুষ ছিলেন। প্রতিটি মানুষের মতোই তাঁরা পানাহার করতেন। হাট–বাজার ও রাস্তা–ঘাটে চলাফেরা করতেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ
مَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ - (انبیاء: ۷-۸)

"তোমার পূর্বে আমরা যেসব রসূল পাঠিয়েছি, তারাও মানুষই ছিলো। তাদের প্রতি আমরা অহী নাযিল করতাম। তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানী লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখো। সে সব রসূলকে আমরা এমন কোনো দেহ

দেইনি যে, তাদের খেতে হতোনা এবং তারা অমর ছিলো-" (আম্বিয়াঃ৭-৮)

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّاۤ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ
وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ - (الفرقان: ٢٠)

তোমার পূর্বে আমরা যতো রসূল পাঠিয়েছি-তারা সকলেই পানাহার করতো এবং বাজারেও চলাফেরা করতো-(ফোরকানঃ ২০)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً (الرعد: ٣٨)

"তোমার পূর্বেও আমরা বহুসংখ্যক রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে আমরা স্ত্রীও বানিয়েছি এবং সন্তানাদি পয়দা করেছি"-(রাআদঃ৩৮)

অতপর রসূলুল্লাহ (সঃ) কে নির্দেশ দেয়া হলো যেনো তিনি তাঁর মানুষ হবার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেন, যাতে করে তাঁর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকে খোদায়ীর গুনে গুনান্বিত না করে, যেমনটি করা হয়েছিল তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণকে। বস্তুতঃ কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - (كهف)

হে মুহাম্মদ! বলে দাওঃ আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। আমার প্রতি অহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের খোদা শুধুমাত্র এক ও একক-(কাহাফঃ ১১১,হামীমুস সাজদাঃ৬)।

এ বিশদ বিশ্লেষণ শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কেই যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেনি; বরঞ্চ সকল পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীন সম্পর্কিত এরূপ ভ্রান্ত ধারণাও দুর করেছে।

রসূলের শক্তি ও অস্বাভাবিক ক্ষমতা

দ্বিতীয় যে বিষয়টি কোরআন মজীদে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে রসূল (সঃ) এর শক্তি ও কুদরত বা অস্বাভাবিক ক্ষমতা। অজ্ঞতা মুর্খতা

যখন খোদার নৈকট্য লাভকে খোদায়ীর সমার্থক বানিয়ে দিলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ আক্বীদাহ জন্ম নিলো যে, খোদার নৈকট্য লাভকারী লোকেরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। খোদার কারখানায় তারা বিশেষ কিছু ক্ষমতার অধিকারী হয়। পুরস্কার ও শাস্তি দানের ব্যাপারে তাদের হাত থাকে। গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাদের জানা। তাদের মর্জি ও অভিমত অনুযায়ী ভাগ্যের ফয়সালা ওলট পালট হয়। মানুষের লাভ লোকসানে তাদের হাত থাকে। তারা ভালো মন্দের মালিক হয়। বিশ্ব জাহানের সকল শক্তিই তাদের অনুগত হয়। এক নজরে মানুষের মন পরিবর্তন করে তারা তাদের গোমরাহী দূর করতে পারে। এসব ধারণার ভিত্তিতে লোকেরা মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট আশ্চর্য ধরণের প্রশ্ন করতো। কোরআনে এরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ
تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا
تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ
تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ
أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا
نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (بنی اسرائیل ۹۰)

লোকেরা বলেঃ আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথা মানিবোনা যতোক্ষণ না তুমি যমীণ থেকে আমাদের জন্যে একটা ঝর্ণা প্রবাহিত করবে; অথবা তোমার জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান রচিত হবে এবং তার মধ্যে তুমি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করবে। অথবা আকাশকে টুকরো টুকরো করে আমাদের উপর ফেলে দেবে যা নাকি তুমি দাবী করছো অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে হাযির করবে। অথবা তোমার জন্যে একটা সোনার ঘর তৈরী হবে। কিংবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। আর তোমার আরোহণকেও আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মানবোনা যতোক্ষণ না তুমি সেখান থেকে আমাদের জন্যে একখানা লিপি অবতীর্ণ করবে যা আমরা পড়বো। হে মুহাম্মদ! তুমি বলে দাওঃ সকল ত্রুটি–বিচ্যুতির উর্দ্ধে আমার

রব। আমি কি একজন পয়গাম বাহক মানুষ ছাড়া আর কিছু? (বনী ইসরাঈলঃ৯০–৯৩)

খোদা প্রাপ্তি ও বুযুর্গি সম্পর্কে মানুষের যতো ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান ছিলো, সে সবের খন্ডন করে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, খোদায়ী ক্ষমতা ও খোদায়ী কর্মকান্ডে রসূলের বিন্দুমাত্র অংশ নেই। তিনি আরো বলে দিলেন যে, খোদার হুকুম ছাড়া নবী কাউকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা তো দূরের কথা স্বয়ং তাঁর উপর আপতিত ক্ষতি ও বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষার ক্ষমতাও তার নেইঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ـ (انعام: ١٧)

আল্লাহ যদি তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে চান তবে তিনি ছাড়া তোমাকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমাকে কোনো কল্যাণ দান করতে চান তাহলেও তিনি সর্বশক্তিমান। (আনআম)ঃ ১৭)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (يونس: ٤٩)

(হে মুহাম্মদ) বলো, আমার নিজের জন্যে কোনো প্রকার লাভ ও ক্ষতির এখতিয়ার আমার নেই। অবশ্যি খোদা চাইলে সে ভিন্ন কথা। (ইউনুসঃ ৪৯)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলে দিলেন যে, নবীর নিকট আল্লাহর ভান্ডারের চাবিও নেই। না তিনি গায়েবের ইলম জানেন আর না তিনি অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারীঃ

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحٰى إِلَيَّ (انعام: ٥٠)

হে মুহাম্মদ, তাদের বলো, আমি তোমাদের বলছিনে যে, আমার নিকট খোদার ধন–ভান্ডার রয়েছে অথবা আমি গায়েব জানি। আর এ কথাও আমি তোমাদের বলছিনে যে আমি একজন ফেরেশতা। আমি তো কেবল সেই অহীরই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি নাযিল হয়। (আন–আম–৫০)

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - (اعراف: ١٨٨)

আমি যদি গায়েবই জানতাম, তবে তো আমার নিজের জন্যে সমস্ত ফায়দাই লুটে নিতে পারতাম। আর কোনো ক্ষতিই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আসলে আমিতো সেসব লোকদের জন্যে সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র যারা আমার কথা মেনে নেয়–(আরাফঃ১৮৮)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলে দিলেন যে, শাস্তি, পুরস্কার ও হিসেব নিকেশে নবীর কোনো হাত নেই। তাঁর কাজ হচ্ছে শুধু আল্লাহ্র বাণী পৌছে দেয়া এবং মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা। মানুষের হিসেব নিকেশ নেয়া, তাদের পাকড়াও করা এবং তাদের শাস্তি ও পুরস্কার দান করা হচ্ছে খোদার কাজঃ

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۔ قُلْ
لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ - (انعام: ٥٧، ٥٨)

হে মুহাম্মদ বলোঃ আমি আমার খোদার নিকট থেকে প্রাপ্ত এক উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ তোমরা তো অবিশ্বাস করলে। সেই জিনিস আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই যা পেতে তোমরা তাড়াহুড়া করছো। ফয়সালা করার সমস্ত এখতিয়ার শুধু আল্লাহ্র। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি উত্তম ফয়সালাকারী। হে নবী বলে দাওঃ তোমরা যে জিনিসের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছো তা যদি আমার আয়ত্তেই থাকতো তাহলে আমার এবং তোমাদের মধ্যে কবেইনা ফয়সালা হয়ে যেতো। কিন্তু যালেমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত–তা আল্লাহই ভালো জানেন–(আন–আমঃ ৫৭–৫৮)

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (الرعد: ٤٠)

হে নবী! তোমার কাজ হচ্ছে পয়গাম পৌঁছে দেয়া আর হিসেব নেয়া আমার দায়িত্ব–(রাআদঃ ৪০)

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (الزمر: ٤١)

হে নবী! মানুষের হেদায়াতের জন্যে সত্যসহ এ কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন যে কেউ হেদায়াত গ্রহণ করবে সে তা নিজের জন্যেই ভাল করবে। আর যে গোমরাহীতে লিপ্ত হয় সে তার নিজের জন্যেই অমংগল করে। আর তুমি তাদের কোনো যিম্মাদার নও (যুমারঃ ৪১)

আরো বলে দেয়া হলো, মানুষের অন্তর ঘুরিয়ে দেয়া কিংবা যারা সত্যকে মেনে চলতে প্রস্তুত নয়, তাদের মধ্যে ঈমান পয়দা করে দেয়া নবীর সাধ্যের অতীত। তিনি পথ প্রদর্শক শুধু এ অর্থে যে, নসীহত ও উপদেশের হক তিনি পুরোপুরি আদায় করেন। আর যে ব্যক্তি সত্যপথ পেতে চায়–তাকে তিনি পথ দেখিয়েদেন।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ
وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن
يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ - (النمل: ٨٠، ٨١)

তুমি মৃতকে শুনাতে পারো না। সেই বধিরদেরও তুমি তোমার আওয়াজ পৌঁছাতে পারোনা, যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যেতে চায়। আর না তুমি অন্ধ লোকদের গোমরাহী থেকে বের করে সোজা পথে এনে দিতে পারো। তুমি কেবল সেই সব লোকদেরই শুনাতে পারো–যারা আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে আর আনুগত্যের মস্তক অবনত করে–(আন–নহলঃ ৮০–৮১)।

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ - إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ - إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا - (فاطر-٣)

কবরের মৃতদেরকে তুমি শুনাতে পারোনা। তুমি তো একজন সাবধানকারী মাত্র। আমরা তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি" ১ (ফাতেরঃ ২২–২৪)

অতপর সুস্পষ্ট ভাবে এ কথাও বলে দেয়া হলো যে নবী করীম (সঃ) এর যা কিছু ইয্‌যত, কদর ও মর্যাদা লাভ হয়েছে, তা সবই এ কারণে হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেন। সঠিক ভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী চলেন এবং তাঁর প্রতি যে বাণী নাযিল হয় তা হুবহু আল্লাহ্‌র বান্দাদের নিকট পৌছেদেন। অন্যথায় তিনি যদি আল্লাহ্‌র ইতায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং আল্লাহ্‌র কালামের সাথে নিজের মনগড়া কথা মিশিয়ে দেন– তাহলে তাঁর কোনো বিশেষত্বই বাকী থাকে না। বরঞ্চ তিনি আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারেন না।

---

(১) কুরআনের অন্য একস্থানে এ কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (القصص-٥٦)

হে নবী। তুমি যাকে চাও, তাকে হেদায়াত করতে পারোনা। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন যারা হেদায়াত কবুলকারী তাদেরকে আল্লাহ্ খুব ভালো করেই জানেন–(কাসাসঃ৫৬)

বুখারী ও মুসলিমের বর্ননানুযায়ী এ আয়াত নবী করীম (সঃ) এর চাচা আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়। তাঁর যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন নবী করীম (সঃ) আপ্রান চেষ্টা করেন, তিনি যেনো কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন যাতে করে ঈমানের সাথে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর জীবন দেয়াকেই অগ্রাধিকার দিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নবীকে বলেনঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ - (البقرة : ١٤٥)

(হে নবীঃ) তোমার নিকট ইল্‌ম পৌঁছার পর তুমি যদি তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো, তাহলে নিশ্চিতরূপে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। (আল –বাকারাহঃ ১৪৫)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ - (البقرة : ١٢٠)

তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো, তাহলে তোমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাচাঁবার জন্যে কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী হবেনা– (বাকারাঃ ১২০)

(হে নবী, তুমি যাকে চাও, তাকে হেদায়াত করতে পারোনা)। কিন্তু মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণের সুবিদিত পদ্ধতি এই যে, কোনো আয়াত নবী–যুগের কোনো ব্যাপারে প্রযোজ্য হলে –তাঁরা সে ব্যাপারটাকে ঐ আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে বর্ণনা করেন। এ কারণেই তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনে উমার (রাঃ) প্রমুখের এ বর্ণনা ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য বর্ণনা থেকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যায়না যে, এ আয়াতটি আবু তালিবের ওফাতের সময়ই নাযিল হয়। বরঞ্চ এগুলো থেকে এতোটুকু মনে হয় যে, এ আয়াতটির বিষয়বস্তুর সত্যতা এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে। যদিও আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দাহ্‌কেই সঠিক পথে আনার আন্তরিক কামনা নবীপাক (সঃ) এর ছিলো। কিন্তু কোনো ব্যক্তির কুফরীর উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ তাঁর কাছে সর্বাধিক কষ্টকর হয়ে থাকলে এবং কোনো ব্যক্তির হেদায়াত লাভ তাঁর সর্বাধিক কামনার বস্তু হয়ে থাকলে , সে ব্যক্তিটি ছিলেন আবু তালিব। সুতরাং তাকেও যখন তিনি হেদায়াত দান করতে সক্ষম হননি, তখন এ কথা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কাউকেও হেদায়াত দান করা এবং কাউকেও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করা নবীর ক্ষমতা বহির্ভূত। এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পদ কোনো আত্মীয়তা – বেরাদরির ভিত্তিতে দান করা হয়না। বরঞ্চ করা হয় মানুষের স্বীকৃতি, যোগ্যতা এবং ঐকান্তিক সত্যপ্রিয়তার ভিত্তিতে।

قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِيٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ-

হে মুহাম্মদ, তাদের বলে দাওঃ এ কালামের মধ্যে আমার নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার রদবদল করার এখতিয়ার অমার নেই। আমি তো শুধু সেই জিনিসই মেনে চলি যা আমাকে অহীর মাধ্যমে বলা হয়। অমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমার বিরাট দিনের শাস্তির ভয় আছে। (ইউনুসঃ ১৫)

এসব কথা এ জন্যে বলা হয়নি যে, মায়াযাল্লাহ্! রসূল (সঃ) কর্তৃক কোনো নাফরমানী বা পরিবর্তন–পরিবর্ধনের সামান্যতম কোনো আশংকাও ছিলো। মূলতঃ এসব কথার উদ্দেশ্য ছিলো দুনিয়ার সামনে এ সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা যে, আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর যে নৈকট্য লাভ হয়েছিল। তার কারণ এ নয় যে, নবীর সাথে আল্লাহ্র কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। বরঞ্চ নৈকট্য লাভের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার পরম অনুগত এবং মনে প্রানে তাঁর বান্দাহ্।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) নবীদেরই দলভুক্ত একজন

তৃতয়ীতঃ যে জিনিসটি কুরআন মজীদে বিশদভাবে বারবার বলা হয়েছে তা হচ্ছে এ যে, মুহাম্মদ (সঃ) কোনো নতুন নবী নন; বরঞ্চ তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের দলভূক্তই একজন এবং নবুওয়াতের সেই ধারাবাহিকতার একটা আংটা বা সংযোজক–যা সৃষ্টির সূচনা থেকে তাঁর আগমণ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো এবং যার মধ্যে প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগের নবী রসূলগণ শামিল রয়েছেন। কুরআনে হাকীম নবুওয়াত ও রেসালাতকে কোনো ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির জন্যে নির্দিষ্ট করেনা। বরঞ্চ সে পরিষ্কার ঘোষনা করে যে, আল্লাহ্ তায়ালা – প্রত্যেক জাতি, দেশ ও যুগে এমন সব মনীষী পয়দা করেছেন, যারা মানুষকে সিরাতুল–মুসতাকীমের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং গোমরাহীর অশুভ পরিণতির ভীতি প্রদর্শন করেছেনঃ

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ- (فاطر: ٢٤)

এমন কোনো জাতি অতীত হয়নি, যাদের মধ্যে কোনো সাবধানকারী আসেনি–(ফাতেরঃ২৪)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوْتَ ـ (النحل : ٣٦)

আমরা প্রতিটি জাতির নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছি (এ পয়গাম সহ): তোমরা আল্লাহ্‌র গোলামী করো এবং তাগুতের গোলামী থেকে দূরে থাকো–(আন নহলঃ ৩৬)

আর এসব পয়গম্বর ও সাবধানকারীদের মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ)ও একজন। বস্তুত, এ কথাটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এরশাদ করা হয়েছেঃ

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى (النجم : ٥٦)

পূর্ববর্তী সাবধানকারীদের মতো ইনিও একজন সাবধানকারী (আন নাজমঃ ৫৬)

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (يٰس : ٣)

হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত–(ইয়াসীনঃ ৩)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَ
لَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (احقاف : ٩)

হে মুহাম্মদ, বলে দাও ঃ আমি কোনো অভিনব রসূল নই। আমি জানিনা আমার সাথে কি আচরণ করা হবে আর তোমাদের সাথেইবা কি আচরণ করা হবে। আমি তো শুধু সে জিনিসই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহী করা হয়। আর আমি নিছক একজন প্রকাশ্য সাবধানকারী –(আহকাফঃ ৯)

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ (اٰل عمران : ١٤٤)

মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পূর্বেও অনেক রসূল অতীত হয়েছে–(আলে ইমরানঃ ১৪৪)

শুধু তাই নয়; বরঞ্চ এ কথাও বলে দেয়া হলো যে, রসূলে আরাবীর দাওয়াত তো তাই যার দিকে সৃষ্টির সূচনা থেকে সকল হকের আহবানকারী দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। তিনি প্রাকৃতিক দ্বীনেরই শিক্ষা দিয়ে থাকেন–যার শিক্ষা প্রত্যেক নবীরসূল হরহামেশা দিয়ে এসেছেন–ঃ

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ط فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا (بقره - ١٦)

তোমরা বলোঃ আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র প্রতি এবং সে শিক্ষার প্রতি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ সবের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের বংশধরদের উপর এবং যা কিছু দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা এবং আমরা আল্লাহ্‌রই অনুগত। তারাও যদি ঠিক সেরূপ ঈমান আনে, যেমনটি তোমরা এনেছ তাহলে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। (বাকারাঃ ১৩৪–৩৭)।

কুরআন মজীদের এসব সুস্পষ্ট বর্ননা এ সত্যের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ রাখেনি যে, মুহাম্মদ (সঃ) কোনো নুতন দ্বীন নিয়ে আসেননি আর না তিনি পূর্ববর্তী নবীদের কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বা তাদের কারো পয়গাম রহিত করার জন্যে এসেছেন। বরঞ্চ তাঁকে তো এ জন্যে পাঠানো হয়েছে যে, যে সত্য দ্বীন প্রথম দিন থেকে সকল জাতির নবীগণ পেশ করে এসেছেন–তাকে তিনি পরবর্তীকালের লোকদের কৃত ভেজাল থেকে মুক্ত করবেন।

মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমনের উদ্দেশ্য

এমনি করে কুরআন মজীদ তার বাহকের যথার্থ মর্যাদা নিরূপন করে তার ঐসব কার্যাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করেছে, যে গুলো সম্পাদন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। সামগ্রিক ভাবে তাঁর এ সব কার্যাবলী দু' ভাগে বিভক্তঃ এক –শিক্ষা বিভাগ,দুই–বাস্তব কর্ম বিভাগ।

তাঁর শিক্ষাদান কাজ

এ বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

একঃ তেলাওয়াতে আয়াত, তাযকিয়ায়ে নফ্স এবং কিতাব ও হিকমতের তা'লীমঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔ (آل عمران: ١٦٤)

আল্লাহ্ ঈমানদারদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট এমন একজন রসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদের আল্লাহ্র আয়াত শুনান, তাদের তাযকিয়া–(পরিশুদ্ধি) করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অথচ তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো (আলে ইমরানঃ ১৬৪)

আল্লাহ্র আয়াত শুনানোর অর্থ হচ্ছে–তাঁর বানীসমূহ হুবহু শুনিয়ে দেয়া। তায্কিয়ার অর্থ –মানুষের জীবন ও আচার–আচরণকে অসৎ কর্মকান্ড, কুপ্রথা ও অন্যায় রীতি–পদ্ধতি থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্দ করে তাদের মধ্যে মহৎ গুণাবলী, পূতচরিত্র এবং সঠিক রীতি পদ্ধতির রিকাশ সাধন করা। আর কিতাব ও হিকমাতের তা'লীম দেয়ার অর্থ হচ্চে, মানুষকে খোদার কিতাবের সঠিক উদ্দেশ্য ও দাবী বুঝিয়ে দেয়া এবং তাদের মধ্যে এমন অন্তদৃষ্টি সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে করে তারা খোদার কিতাবের মর্মমূলে উপনীত হতে পারে। আর তাদেরকে ঔসব কলা–কৌশল শিক্ষা দেয়া যা দ্বারা তারা নিজেদের জীবনের বিভিন্ন ও ব্যাপক দিক সমূহকে পুরোপুরি আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে পারে।

দুইঃ দ্বীনের পূর্ণতাঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا - (المائدہ: ۳)

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম,তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পুরোপুরি দিয়ে দিলাম। আর তোমাদের জন্যে ইসলামের জীবন ব্যবস্থাকে মনোনীত করলাম– (মায়িদাহ্ঃ ৩)

অন্য কথায় কুরআনের প্রেরক তার বাহকের দ্বারা শুধু এতোটুকু খেদমত গ্রহণ করেননি যে, তিনি আয়াত তেলাওয়াত করবেন, লোকের আত্মশুদ্ধি করবেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেবেন। বরঞ্চ তিনি তাঁর এ নেক বান্দাহ্র দ্বারা এসব কাজের পূর্ণতা সাধন করিয়েছেন। গোটা মানব জাতির জন্যে যতো আয়াত পাঠাবার প্রয়োজন ছিলো—তা সবই তাঁর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। যেসব অন্যায়–অনাচার থেকে মানব জীবনকে পবিত্র করা বাঞ্ছনীয় ছিলো–তা সবই তাঁর দ্বারা বিদূরিত করে দিয়েছেন। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যেসব গুণাবলীর বিকাশ যতোটা সুন্দরভাবে হওয়া উচিত ছিলো তার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা তাঁর নেতৃত্বে উপস্থাপিত করে দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা কিতাব ও হিকমাতের এমন শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন যাতে করে ভবিষ্যতের সকল যুগে কুরআনের বাঞ্ছিত পদ্ধতিতে মানব জীবন গঠন করা যেতে পারে।

তিনঃ তৃতীয় কাজ হচ্ছে ঐ সকল মতবিরোধের মর্ম সুস্পষ্ট করে দেয়া যা মূল দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো। তারপর সে দ্বীনকে যে পর্দায় আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিল তা উন্মোচন করে দেয়া এবং তার মধ্যে মিশ্রিত ভেজাল ও সকল প্রকার জটিলতা দূর করে সে সত্য–সঠিক পথ পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত করে দেয়া–যা অনুসরণ করা আবহমান কাল থেকে আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভের একমাত্র পথ ছিলোঃ

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ - (النحل: ۶۳،۶۴)

খোদার শপথ (হে মুহম্মদ!) তোমার পূর্বেও আমরা বিভিন্ন জাতির নিকট হেদায়াত পাঠিয়েছি। কিন্তু শয়তান তাদের অপকর্মগুলো তাদের জন্যে মনোমুগ্ধকর বানিয়ে দিয়েছে। বস্তুত, আজ সে–ই তাদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েছে। আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি শুধু এ জন্যে নাযিল করেছি – যেনো তুমি তাদের সামনে সে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারো, যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায় এবং এজন্যে যে, এ কিতাব তাদের জন্যে রহমত ও হেদায়াত স্বরূপ হবে–যারা তা মেনে চলবে – (আন– নহলঃ ৬৩–৬৪)

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا
كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَاءَكُمْ
مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (المائدہ: ١٥،١٦)

হে আহলে কিতাব। তোমাদের নিকট আমাদের রসূল এসেছেন। তিনি তোমাদের সামনে অনেক সব বিষয় সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যা তোমরা খোদার কিতাব থেকে গোপন করে রাখো। অনেক কথা আবার মাফও করে দেন। খোদার নিকট থেকে তোমাদের কাছে একটি আলোক এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পসন্দ মতো যারা চলে তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখিয়ে দেন। এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন । এবং তাদেরকে সরল–সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন। (মায়িদাহঃ১৫–১৬)

চারঃ নাফরমানদের ভীতি প্রদর্শন করা, অনুগত বান্দহদের আল্লাহ্‌র রহমতের সুসংবাদ দেয়া এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার করাঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا
وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ (احزاب: ٤٥،٤٦)

হে নবী। আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্য ও সুসংবাদদাতা এবং ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহবানকারী ও প্রদীপ হিসেবে (আহযাবঃ ৪৫–৪৬)

দুইঃ তাঁর বাস্তব (আমলী) কার্যাবলী

বাস্তব জীবন ও তৎসংক্রান্ত যেসব দায়িত্ব নবী করীম (সঃ) এর উপর অর্পিত হয়েছিলো–তা নিম্নরূপঃ

একঃ ন্যায়ের নির্দেশ দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, হালাল-হারামের সীমা-রেখা নির্ধারণ করা, মানুষকে খোদা ব্যতিত অন্যান্যের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ থেকে মুক্ত করা এবং তাদের চাপিয়ে দেয়া বোঝা লাঘব করাঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (اعراف:١٥٧)

সে তাদেরকে নেক কাজের নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তাদের জন্যে পবিত্র জিনিস সমূহ হালাল এবং অপবিত্র জিনিস সমূহকে হারাম করে। আর তাদের উপর থেকে সেসব বোঝা নামিয়ে দেয় ও সেসব বন্ধন ছিন্ন করে যার দ্বারা তারা আবদ্ধ ছিলো। অতএব যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে যা তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে। তারাই কল্যাণ লাভ করবে (আ'রাফঃ ১৫৭)

দুইঃ খোদার বান্দাহ্‌দের মধ্যে হক ও ইনসাফের সাথে ফয়সালা করাঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا - (النساء-١٠٥)

হে নবী! আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি যাতে করে তুমি আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া আইন–কানুন অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার – ফয়সালা করতে পারো, আর তুমি খেয়ানত কারীদের উকিল না হয়ে পড়–(নিসাঃ১০৫)

তিনঃ আল্লাহ্‌র দ্বীনকে এমনভাবে কায়েম করে দেয়া যেনো মানব জীবনের সমগ্র ব্যবস্থা তার অধীন হয়ে যায় এবং অন্যান্য সকল ব্যবস্থা তার মুকাবেলায় পরাস্ত হয়ে থাকেঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - (الفتح : ٢٨)

তিনি আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যজীবন –ব্যবস্থা সহ পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি এ দ্বীনকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থা সমূহের উপর বিজয়ী করেন–(আল ফাতাহঃ২৮)

এমনিভাবে নবী (সঃ) এর কার্যাবলীর এ বিভাগটি রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সংস্কার–সংশোধন এবং সৎ ও ন্যায় –নিষ্ঠ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার সকল দিকে পরিব্যাপ্ত।

নবুয়্যতে মুহাম্মদীর বিশ্বজনীনতা ও চিরস্থায়ীত্ব

নবুয়্যতে মুহাম্মদীর কাজ কোনো বিশেষ জাতি, দেশ ও যুগের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। বরঞ্চ তা গোটা মানব জাতি ও সকল যুগের জন্যে সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - (السبا: ٢٨)

হে মুহাম্মদ ! আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা–(সাবাঃ২৮)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨالَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (اعراف: ١٥٨)

হে মুহাম্মদ বলোঃ হে মানব জাতি। আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই খোদার রসূল , যিনি যমীন ও আসমানের বাদশাহীর মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো খোদা নেই, যিনি মৃত্যু ও জীবনদান করতে পারেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো খোদার প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যিনি খোদা ও তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি ঈমান রাখেন। তোমরা তার অনুসরণ করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবে (আ'রাফঃ১৫৮)

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ - (انعام: ١٩)

এ কুরআন আমার নিকট অহী করা হয়েছে যেনো এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌছুবে–তাদের সকলকে সাবধান করে দিতে পারি (আনয়ামঃ১৯)

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ (التكوير: ٢٧، ٢٨)

এ কুরআন গোটা জগদ্বাসীর জন্যে নসীহত, (বিশেষ করে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে যে তোমাদের মধ্যে থেকে সঠিক পথে চলতে চায়– (তাকবীরঃ২৭–২৮)

খতমে নবুয়্যত

কুরআন মজীদ নবুয়্যতে মুহাম্মদীর আরো একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের বলে দেয়। তা হচ্ছে এ যে, নবুয়্যত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা তাঁর পর্যন্তই শেষ করে দেয়া হয়েছে। তাঁরপরে পৃথিবীতে আর কোনো নবীর প্রয়োজন রইল না।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ - (احزاب: ٤٠)

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন বরঞ্চ তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তকারী (আহযাবঃ ৪০)

এ হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে নবুয়্যতে মুহাম্মদীর বিশ্বজনীনতা, চিরস্থায়ীত্ব ও দ্বীনের পূর্ণতার অবশ্যাম্ভাবী ফলশ্রুতি। যেহেতু কুরআন মজীদের উপোরোল্লেখিত বর্ণনা সমূহের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সঃ)এর নবুয়্যত গোটা মানব জাতির জন্যে , কোনো একটি জাতির জন্যে নয়। চিরকালের জন্যে, কোনো একটি যুগের জন্যে নয়। আর তার মাধ্যমে সে কাজও পরিপূর্ণ হয়েছে যার জন্যে দুনিয়ায় নবীগণের আগমনের প্রয়োজন ছিলো। এ কারণে এটা একেবারে ন্যায় সংগত কথা যে, তাঁর থেকে নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা শেষ করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টিকে নবী করীম (সঃ) স্বয়ং সুন্দর করে একটি হাদীসে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ "নবীদের মধ্যে আমার উদাহরণ হচ্ছে এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি খুব সুন্দর একটা বাড়ী তৈরী করলো এবং গোটা নির্মাণ কাজ শেষ করে শুধু মাত্র একটা ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। এখন যারাই তার চারপাশে ঘুরে ফিরে দেখলো, এ খালি জায়গাটা তাদের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করলো এবং তারা বলতে লাগলো এ খালি জায়গাটায় শেষ ইটটাও যদি লাগিয়ে দেয়া হতো তাহলে বাড়ীটা একেবারেই পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। এখন নবুয়্যত প্রাসাদে যে ইটখানির জায়গা খালি আছে, সে ইট হচ্ছি আমি। আমার পরে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবেনা।" এ উদাহরণ থেকে খতমে নবুয়্যতের কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। যখন দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেলো, আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হলো, আদেশ –নিষেধ, আকায়েদ –এবাদত, তামাদ্দুন, সমাজ, শাসন ও রাজনীতি মোটকথা মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে পুরোপুরি নির্দেশ দিয়ে দেয়া হলো,দুনিযার সামনে আল্লাহ্‌র কালাম ও রসূলের উত্তম আদর্শ এমন ভাবে পেশ করে দেয়া হলো যে ,তা সকল প্রকার বিকৃতি ও ভেজাল থেকে মুক্ত হলো। সকল যুগেই তার থেকে হেদায়াত গ্রহণ করা যেতে পারে। এখন নবুয়্যতের আর কোনো প্রয়োজন রইল না। শুধু প্রয়োজন রইল সংস্কার ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজ, যার জন্যে হক পন্থী ওলামায়ে কে.. সত্য পন্থী মুমিনদের জামায়াতই যথেষ্ট।

নবী (সঃ) এর প্রশংসনীয় গুণাবলী

শেষ যে কথাটি জানতে বাকী থাকে তা এই যে, এ গ্রন্থের বাহক ব্যক্তিগতভাবে কোন্ ধরণের নৈতিক –চরিত্রের অধিকারী ছিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে কুরআন মজীদে অন্যান্য প্রচলিত কিতাবের মতো তার বাহকের পক্ষে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়নি। তাঁর প্রশংসাকে স্থায়ী আলোচ্য বিষয় বস্তুতেও পরিণত করা হয়নি। অবশ্য কথার সূচনাতে শুধু ইশারা– ইংগিতে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে। তার থেকে অনুমান করা যায়, সে ভাগ্যবান সত্তার মধ্যে মানবতার কামালিয়াতের সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য গুলো বিদ্যমান ছিলোঃ

একঃ কুরআন ঘোষণা করে যে তার বাহক নৈতিক–চরিত্রের উচ্চতম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেনঃ

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ (ن-۱) سوره قلم: ۴

এবং হে মুহাম্মদ! তুমি নিশ্চয়ই মহান চরিত্রের অধিকারী–(নূনঃ ৪)।

দুইঃ কুরআন বলে, তার বাহক এমন দৃঢ় সংকল্প , সঠিক পরিকল্পনাবিদ,সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর এমন নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন যে,তাঁর সমগ্র জাতি তাঁকে নির্মূল করে দেয়ার জন্যে বদ্ধ পরিকর হয় এবং তিনি মাত্র একজন সাহায্যকারীসহ এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তখন সে চরম সংকট মুহূর্তেও তিনি মনোবল হারিয়ে ফেলেননি, বরঞ্চ স্বীয় সংকল্পে অটল অবিচল থাকেনঃ

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا - (توبه: ۴۰)

স্মরণ করো, যখন কাফেরগণ তাঁকে বের করে দিয়েছিলো এবং যখন পর্বত গুহায় তিনি একজন লোকের সাথে ছিলেন, যখন তিনি তার সাথীকে বলছিলেনঃ চিন্তা করোনা, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন (তওবাঃ ৪০)

তিনঃ কুরআন বলে যে, তার বাহক অত্যন্ত উদার ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে

দোয়া করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর এ অকাট্য ফয়সালা শুনিয়ে দিতে হয় যে, তিনি ঐসব লোকদের ক্ষমা করবেন নাঃ

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۔ (توبه : ٨٠)

তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর নাই করো, যদি সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করো তবু আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। (তওবাঃ ৮০)

চারঃ কুরআন বলে, তার বাহক অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন। তিনি কখনো কারো সাথে কঠোরতা অবলম্বন করেননি। এ কারণে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলোঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۔ (آل عمران: ١٥٩)

এটা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি নরমদিল। যদি তুমি কর্কশভাষী অথবা কঠিন হৃদয়ের হতে, তাহলে এরা সব তোমার চার পাশ থেকে সরে পড়তো–(আলে ইমরানঃ ১৫৯)

পাঁচঃ কুরআন বলে, তার বাহক খোদার বান্দাহদের সঠিক পথে আনার জন্যে সদা পেরেশান থাকতেন। তারা গুমরাহীর জন্যে জিদ করলে তাঁর অন্তরে দারুন ব্যথা লাগতো। এমনকি তিনি তাদের জন্যে দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۔ (الكهف: ٦)

হে মুহাম্মদ! মনে হচ্ছে তুমি যেনো তাদের জন্যে দুঃখ–চিন্তায় নিজের জীবনটাকেই হারিয়ে ফেলবে যদি তারা একথার উপর ঈমান না আনে–(কাহাফঃ ৬)

ছয়ঃ কুরআন বলে, তার বাহক তাঁর আপন উম্মতের জন্যে পরম ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি তাদের কল্যাণকামী ছিলেন। তারা ক্ষতিগ্রস্থ হলে তিনি মর্মাহত হতেন। তিনি তাদের জন্যে স্নেহশীল ও দয়া পরবশ ছিলেনঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (توبه: ١٢٨)

তোমাদের নিকট স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকেই এমন একজন রসূল এসেছেন। তোমাদের ক্ষতি করে এমন প্রতিটি জিনিস তার জন্যে কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। ঈমানদারদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু–(তওবাঃ ১২৮)

সাতঃ কুরআন বলে যে, তার বাহক শুধু আপন জাতির জন্যেই নয় বরঞ্চ গোটা বিশ্ব জগতের জন্যে ছিলেন আল্লাহ্‌র রহমতঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - (انبياء: ١٠٧)

হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে সমগ্র জগতের জন্যে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছিঃ (আম্বিয়াঃ ১০৭)

আটঃ কুরআন বলে, তার বাহক রাত্রে ঘন্টার পর ঘন্টা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন এবং খোদার স্মরণে দাঁড়িয়ে থাকতেনঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ - (المزمل: ٢٠)

হে মুহাম্মদ! তোমার রব জানেন, তুমি রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো (মুযযাম্মিলঃ ২০)

নয়ঃ কুরআন বলে, তার বাহক একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। জীবনে কখনো তিনি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হননি, অনিষ্টকর চিন্তাধারা কখনো তাঁকে প্রভাবিত করেনি, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে সত্যের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারিতহয়নি।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (النجم: ٢-٣)

হে লোকেরা! তোমাদের সাথী না কখনো সত্য পথ থেকে বিভ্রত হয়েছে, না সঠিক চিন্তাভ্রষ্ট হয়েছে, আর না সে মনের ইচ্ছে মতো কথা বলে। (আন-নাজমঃ ২-৩)

দশঃ কুরআন বলে,তার বাহক ছিলেন সারা দুনিয়ার জন্যে অনুসরণ যোগ্য আদর্শ এবং সমগ্র জীবনে চারিত্রিক পরিপূর্ণতার সঠিক মানদন্ড।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (احزاب: ٢١)

রসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে (আহযাবঃ ২১)।

কুরআন মজীদ বার বার অধ্যয়ন করলে তার বাহকের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে পারা যায়; কিন্তু এ প্রবন্ধে তার বিশদ বিবরণের অবকাশ নেই। কুরআন অধ্যয়ন করলে যে কোনো লোক দেখতে পারে, প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ গুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত এ কুরআন তার বাহকের যে স্বরূপ পেশ করে তা স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ও নির্মল। তাতে না খোদায়ীর কোনো চিহ্ন আছে, না আছে প্রশংসা ও গুণকীর্তনে কোনো অতি রঞ্জন। না তাঁর প্রতি কোনো প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করা হয়েছে। না তাঁকে খোদার কর্মকান্ডের অংশীদার করা হয়েছে। আর না তাঁর প্রতি এমন সব দুর্বলতার অভিযোগ করা হয়েছে-যা একজন পথ প্রদর্শক ও সত্য পথের দিকে আহবানকারীর জন্যে অমর্যাদাকর। যদি দুনিয়া থেকে ইসলামী সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থাবলী বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং শুধু মাত্র বাকী থাকে কুরআন মজীদ, তবুও রসূলে আকরম (সঃ) সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ধারনা, কোনো সন্দেহ-সংশয় বা আক্বীদাহ ভ্রষ্ট হবার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকবেনা। আমরা ভালভাবে জানতে পারি, এগ্রন্থের বাহক একজন কামেল মানুষ ছিলেন। সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের সত্যতা স্বীকারকারী ছিলেন। তিনি কোনো নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। অতিমানবীয় মর্যাদার দাবীও তিনি করতেননা। তাঁর নবুয়্যত ছিলো গোটা বিশ্ব মানবতার জন্যে। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রেরন করা হয়েছিল। তিনি যখন সেসব দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেন, তখন নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা তাঁর পর্যন্ত পৌছার পর সমাপ্ত হয়ে যায়।

—শেষ—

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন** (১-১৯ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন** (১-১৪ খণ্ড)
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ** (১-১০ খণ্ড)
  - মতিউর রহমান খান
- **সহীহ আল বুখারী** (১-৬ খণ্ড)
  - ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র)
- **সুনান ইবনে মাজা** (১-৪ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- **শারহু মাআনিল আছার** (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  - ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- **সীরাতে সরওয়ারে আলম** (১-২ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম**
  - মুহাম্মাদ কুতুব
- **ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **পর্দা ও ইসলাম**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়**
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- **কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন**
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- **উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান** (১-২ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **মৃত্যু যবনিকার ওপারে**
  - আব্বাস আলী খান
- **মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার**
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী